জাকারিয়া স্বপনের বিজ্ঞান কল্পকাহিনী

ছুটির দিন

উইকএন্ডে অর্থ্যাৎ শনি রবিবারে আমাকে কখনও অফিসে যেতে হয়না।

সপ্তাহে পাচ দিন কাজ করার পর শরীর ঠিক করতেই একদিন ঘুমাতে হয়। তারপর বাকি দিনটা কেটে যায় বাজার-ঘাট আর সারা সপ্তাহের রান্নাবান্না করতে। আমেরিকার যান্ত্রিক জীবন যাকে বলে আর কি। কিন্তু গত শুক্রবার আমার ম্যানেজার এসে বললেন যে, একটা সফটওয়্যার ভারতে তৈরী করা হয়েছে, তাতে বেশ কিছু ভুল ধরা পড়েছে। সোমবারেই সেটা কাষ্টমারকে কপি দিতে হবে। মার্টিনা শনিবারে আসবে সফটওয়্যারটা পরীক্ষা করতে। সাথে আমি থাকলে ভালো হয়।

থাকলে ভালো হয় মানে হলো, আমাকে থাকতে হবে। এখানে ম্যানেজাররা কখনও বলে না, তোমাকে এটা করতে হবে। তারা বলবে, এটা করতে পারলে ভালো হয়। শনিবারে আমার সিনেমা দেখার প্ল্যান ছিল। তাই আমি ম্যানেজারকে বললাম, বাসা থেকে চেক করলে হবে না?

আমার অফিসের সাথে বাসায় হাই-স্পীড কানেকশন আছে। সেটা দিয়ে প্রায়ই ঘরে বসে অফিস করি। ম্যানেজার রাজি হলো না। বললো, তোমার ওই স্পীডে কাজ হবে না। আরো স্পীড লাগবে। তাই ল্যাবেই কাজ করতে হবে। তাই আমার রাজি না হবার কোনও সুযোগই থাকলো না।

মার্টিনা আসবে শুনে অবশ্য মনে মনে খুশি হয়ে গেলাম।

তার দু'টো কারন আছে। এক মার্টিনা অসম্ভব সুন্দরী এবং স্মার্ট। কাপড় চোপড়ে বেশ খোলামেলা। আর দ্বিতীয় কারনটি হলো মার্টিনা হাই-স্পীড কমিউনিকেশনের গুরু। বর্তমান সময়ের ইন্টারনেট যত স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন আছে তার জন্য রাউটারের সফটওয়্যার ডিজাইন করেছে মার্টিনা। আকাশের উপর ভেসে বেড়ানো সবগুলো স্যাটেলাইটের অবস্থান ওর নখ দর্পনে। কোনটা কোন অক্ষে কত বেগে ঘুড়ছে এবং এখন কোন স্যাটেলাইটটি কোথায় অবস্থান করছে সেটা বলতে মার্টিনার কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে। মার্টিনার সাথে কাজ করার একটা সুযোগ আমি হাত ছাড়া করতে চাইলাম না।

স্যান থমাস ধরে গাড়ি চালাচ্ছি। শরিবারে রাস্তা বেশ ফাকা ফাকা। ট্রাফিক ততটা নেই। আমি বেশ উত্তেজিত হয়েই গাড়ি চালাচ্ছি। হাতের ডান দিকে এনভিডিয়া ও কোভাটের মাঝখানে একটা দূর্ঘটনা চোখে পড়লো। পুলিশের লাইট ফ্লাশ করছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। রাস্তায় উঠতেই দূর্ঘটনা। দিনটা নিশ্চই ভালো যাবে না। ট্যাসম্যান থেকে ম্যাককার্থি সড়কে বায়ে মোড় নিয়ে অফিসের পার্কিং লটে ঢুকে গেলাম। সিসকো এখানে নতুন অফিস ও ল্যাব বানিয়েছে। তার তেইশ নম্বর ভবনটি হলো আমার।

পার্কিং লট খালি। দু'তিনটা গাড়ি দূরে দূরে পার্ক করা। একটা বি.এম.ডবলিউ কনভার্টিবল চোখে পড়লো। আমি ওটার পাশে গিয়ে আমার ভাঙ্গা হোন্ডা একর্ডটা রাখলাম। মনে মনে ভাবলাম, যাক ব্যাটা বি.এম.ডবলিউটা আজ একটু হলেও লজ্জা পাবে।

প্রধান সিকিউরিটি গেট খুলার জন্য দরজার পাশেই ছোট্ট যন্ত্রটাতে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল রাখলাম। কমপিউটারটি বললো, দয়া করে আপনার আই.ডি দেখান।

প্যান্টের বেল্টের সাথে ঝুলানো আই.ডি কার্ডটি সামনে ধরলাম। দরজা খুলে গেলো। দরজা পেড়িয়ে লবিতে ঢুকতেই স্পীকারে শুনলাম, সুপ্রভাত মি. স্বপন।

বেশ আবাক হলোম। সাধারন অফিস দিনে তো একটি সুন্দরী মেয়ে অভ্যর্থনা থেকে লাল হাসি দিয়ে বলে, সুপ্রভাত। কিন্তু আজ ছুটির দিন বলে রোবটটি বলছে সুপ্রভাত। বেশ ভালোই লাগলো নতুন ধরনের আপ্যায়নে। আমি ল্যাবের দরজার দিকে পা বাড়ালাম। ভেতরের সেই দরজার কাছে যেতেই আবার স্পীকারে বলা হলো, আপনি নিশ্চই অবগত আছেন যে, আজ ছুটির দিন। ছুটির দিনে এই ভবনের পুরো নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রন থাকে ডী-র হাতে। এখন থেকে আপনি হলেন আমাদের অতিথি। আপনার যেকোনও কাজে আমরা সহায়তা দিতে পারলে ধন্য হবো। যেকোন প্রয়োজনে আপনি মুখে সেটা চাইলেই আমরা বুঝতে পারবো। আপনার কাজ শুভ হোক। ধন্যবাদ।

ডী সম্পর্কে আমি আগেই শুনেছিলাম। এরা হলো সপ্তম প্রজাতির বুদ্ধিমান রোবট। মানুষের সাথে এরা সরাসরি কথা বলে ভাবের আদান প্রদান করতে পারে। এই পৃথিবীতে ডী প্রজাতির রোবট কিছু আছে এই সিলিকনভ্যালীতে, আর কিছু আছে নাসার কাছে।

দরজা খুলে দিলো ডী। করিডোরে অন্ধকার। আমি এগুচ্ছি আর একেকটা লাইট জ্বলে উঠছে, আর পেছনের লাইটগুলো পুনরায় নিভে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ বাচানোর জন্য এই ব্যবস্থা। আজ যেহেতু ছুটির দিন, তাই পুরো ভবন

আলোকিত করে রাখা হচ্ছে না। যে টুকু আলো আমার হাটার জন্য দরকার সেটুকুই দেয়া হচ্ছে। তাই আমি যখন হেটে যাচ্ছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যে, আমার সাথে সাথে আলোও সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

করিডোর পেড়িয়ে যখন ল্যাবে পৌছলাম, সেখানেও অন্ধকার।

এই ল্যাবটি সিসকোর অন্যতম বৃহত্তম দুটোর একটি। বিশাল ভবনটির পুরো নীচতলাটা ল্যাব। শত শত আলমারির মতো রাউটারগুলো লাইনদিয়ে দাড়িয়ে। অন্ধকারে তাদের সবুজ বাতিগুলো কেবল জ্বলছে আর নিভছে। এর মানে হলো ডাটা প্রবাহিত হচ্ছে। আমি হেটে হেটে এগুচ্ছি, সাথে সাথে ডীও আলো নিয়ে এগুচ্ছে। এতো বড় ল্যাবে অন্ধকারে ঠিকমতো দিক বুঝা যাচ্ছিল না। আমি ডীকে জিজ্ঞেস করলাম, মার্টিনা কোথায়?

আমাকে অনুসরন করো। বলেই ডী তার আলোর দিক পরিবর্তন করে দিল। আমি ওর আলো অনুসরন করে পৌছে গেলাম যেখানে মার্টিনা কাজ করছিলো।

আমাকে দেখে মার্টিনা ওর চেয়ার ছেড়ে উঠে এলো। হাই বলে হাত মেলালো। আমি মার্টিনার সুন্দর নেইল পলিশ দেয়া হাতটা ধরে একটু কেপে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছো?

মার্টিনা আমার কাধে হাত দিয়ে বললো, শনিবারে অফিসে এসেছি, বুঝতেই পারছো কেমন আছি। যাইহোক, চলো জটপট কাজটা শেষ করে কেটে পড়ি।

আমি বললাম, কাজটা কি? আমাকে তো আমার ম্যানেজার কিছুই খুলে বলেনি।

আচ্ছা, ভয় পাবার কিছু নেই। আমি তোমাকে কাজটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। তার আগে একটু কফি খেয়ে নেয়া যাক, কি বলো? মার্টিনা হাটতে হাটতে কথা বলতে থাকে। তারপর নির্দেশ দেয়ার মতো করে বলে, “ডী! দু কাপ কফি।”

ডী জবাব দিল, কফি মেশিন চালু করে দেয়া হয়েছে। চিনি কি মিশিয়ে দেবো? তোমরা কে কতটুকু চিনি খাও, সে তথ্য আমার কাছে নেই।

মার্টিনা উত্তরে বললো, আমার ডাটা তুমি ভবন পি-তে পাবে। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলো, স্বপন তুমি কতটুকু চিনি খাও?

আমি বললাম, দেড় চামচ।

ডী বললো, ধন্যবাদ। আমি কি এই ডাটা জমা রেখে দেবো?

আমি বললাম, ঠিক আছে।

কফি কক্ষে যেতে যেতেই কফি তৈরী।

মার্টিনা একটা টেবিলে হেলান দিয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে বলতে শুরু করলো। কাজটা একটু গোপনীয়, ডিফেন্সের কাজ। তাই তোমাকে শুক্রবারে বলা হয়নি।

আমি বললাম, ঠিক আছে বলে যাও।

মার্টিনা বলতে থাকে, তুমি তো জানো আমেরিকা এখন হন্যে হয়ে ওসামা বিন লাদেনকে খুজছে। কিন্তু লাদেন গুহায় লুকিয়ে আছে। সে বের হচ্ছে না। তাই ডিফেন্সের গ্লোবাল পজিশনিং সিষ্টেম (জিপিএস) ওকে খুজে পাচ্ছে না। আমাদের কাজ হলো নতুন সফটওয়্যার তৈরী করা, যা লাদেনকে খুজে বের করতে পারে।

আমি বললাম, ডিফেন্সের বর্তমান জিপিএস সিষ্টেম তো পৃথিবীর যেকোনও স্থানের একটি আলপিনকেও খুজে বের করতে পারে, তাহলে লাদেনকে পাচ্ছে না কেন?

বর্তমান জিপিএস তো যেখানে আলোর সরাসরি প্রবেশ নেই সেখানে কাউকে নির্নয় করতে পারে না। মার্টিনা উত্তর দেয়। তারপর বলতে থাকে, আমাদের নতুন সফটওয়্যার যে কাউকে বাড়ি বা গুহার ভেতরেও নির্নয় করতে পারবে। ভারতে বেশিরভাগ সফটওয়্যার লেখানো হয়েছে। কিছুটা হয়েছে আয়ারল্যান্ডে আর বাকিটা ইসরাইলে। কাউকেই পুরোটা দেয়া হয়নি নিরাপত্তার কারনে। আর তুমি তো জানই ভারতীয়রা কয়েক বছর আগে এই জিপিএস ব্যবহার করেই জেনে গিয়েছিল কোন সময়টায় ডিফেন্সের স্যাটেলাইট ভারতের উপর থাকবে না। তখন তারা পারমানবিক বোমার পরীক্ষাটা করে ফেললো। তাই এই প্রজেক্টে কোনও ভারতীয়কে মূল দায়িত্বে রাখা হয়নি। দেখো, তুমি আবার তোমার দেশকে এই তথ্য পাচার করে দিও না।

আমি বললাম, তোমার কি মাথা খারাপ? আমার দেশের মানুষ খেতেই পায় না তিন বেলা, আর তুমি বলছো পারমানবিক বোমার কথা?

মার্টিনা বললো, দেখো, পাকিস্তান আর ভারতের অনেক মানুষ প্রতিদিন অনাহারে থাকে। তারপরেও তো ওরা এগুলো করছে। সে যাই হোক, তোমাকে বিশ্বাস করা হচ্ছে, তুমি সেটা মানবে। এটাই বড় কথা।

আমি ওকে সাহস দিয়ে বললাম, ঠিক আছে। তুমি আমার উপর নির্ভর করতে পারো।

চমৎকার। চলো এবার কাজে হাত দেয়া যাক। সফটওয়্যারটা আজই কম্পাইল করতে হবে। সোমবারে চলে যাবে লকিড মার্টিনের হাত হয়ে পেন্টাগনে। মার্টিনা কথাটা বলেই ল্যাবের দিকে পা বাড়ালো।

বিশাল একটা পর্দায় মার্টিনা জিপিএস-এর পুরো স্যাটেলাইট সিষ্টেমটি সরাসরি দেখতে পাচ্ছে। এই সিষ্টেম দিয়ে এই গ্রহের যেকোনও স্থানের ক্ষুদ্রতম বিষয়কেও এখানে বসে দেখা যাবে। তার জন্য দুটো শর্ত আছে, যেকোনও একটি হলেই এটা কাজ করবে।

প্রথম শর্ত হলো, বস্তুটি থেকে আলো সরাসরি স্যাটেলাইটের কাছে পৌছাতে হবে। তার মানে হলো ঘরের বাইরের যেকোনও বস্তুকে স্যাটেলাইট ধরতে পারবে। কেউ রাস্তায় হাটছে, গাড়ি চালাচ্ছে, রিক্সায় বসে আছে, উদ্যানে বসে প্রেম করছে - সবই এখানে বসে দেখা যায়। তাতে সেই লোকগুলো কখনই টের পাবে না যে, পৃথিবীর ঠিক উল্টো পিঠে বসেই তাদেরকে কেউ সারাক্ষন দেখছে।

দ্বিতীয় শর্তটি হলো, যদি কারো কাছে এমন কোনও যন্ত্র থাকে যার থেকে রেডিও সিগনাল বের হয়, তাহলে তার অবস্থান নির্নয় করা যাবে। যেমন কেউ যদি ঘরের ভেতরেও মোবাইল ফোন চালু রাখে, তাহলে তাকে খুজে পাওয়া যাবে। সেলুলার ফোন নিয়ে বাথরুমে গেলেও তাতে কাজ হবে, শুধু ফোনটি অন থাকলেই হলো। একইভাবে ওয়্যারল্যাস যন্ত্র ব্যবহার করলেও তাই হবে।

কিন্তু এতো দিন এই দ্বিতীয় শর্ত ব্যবহার করে মানুষটিকে দেখা যেতো না। ফলে কে ফোনটি ব্যবহার করছে সেটা সঠিকভাবে ধরা যেতো না। এখন এই নতুন সফটওয়্যার দিয়ে তাদেরকে দেখা যাবে। সেটাই পরীক্ষা করবে মার্টিনা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সফটওয়্যার কি তৈরী?

মার্টিনা বললো, তুমি আসার আগেই আমি কমপাইল করতে দিয়েছি। আর কয়েক মিনিটের ভেতরই হয়ে যাবে। তারপর সেটা লোড করে দেবো স্যাটেলাইটে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ডিফেন্সের স্যাটেলাইট ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে? সিউডো র‍্যানডম কোড লাগবে না?

মার্টিনা এই প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না। মুচকি হেসে বললো, দেখই না কি হয়।

আমেরিকার ডিফেন্স বিভাগ বারো বিলিয়ন ডলার খরচ করে পৃথিবীর চারদিকে মোট চব্বিশটি স্যাটেলাইট বসিয়েছে। এই স্যাটেলাইটগুলো সাধারণ স্যাটেলাইটের মতো নয়। সাধারন মানুষ যেগুলোর সাহায্যে টিলিভিশন দেখে, আন্তর্জাতিক টেলিফোনে কথা বলে, ফ্যাক্স পাঠায় সেগুলো একধরনের স্যাটেলাইট। সেগুলোর কথা সবাই জানে এবং ওগুলোর অবস্থানও সবার জানা। ঘরে বসে ডিসে টিভি দেখার জন্য ওই স্যাটেলাইটগুলোর যেকোনও একটার দিকে ডিসটি বসিয়ে দেয়া হয় সিগনাল ধরার জন্য। কিন্তু ডিফেন্সের স্যাটেলাইটগুলোর কথা সাধারন মানুষ তো অনেক পরে, আমেরিকার ডিফেন্স বিভাগ ছাড়া এই পৃথিবীর আর কেউ জানে না। পূর্বের রাশিয়া এই চব্বিটির কিছু কিছুর অবস্থান জানতো। কিন্তু রাশিয়ার ভাঙ্গনের পর তাদের স্যাটেলাইট কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন আর কেউ ওগুলোর কথা জানে না।

ডিফেন্স এগুলো বসিয়েছে সারা পৃথিবীতে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার ও গবেষনা করতে। মূলত এগুলো বসানো হয় রাশিয়ার সাথে ঠান্ডা যুদ্ধের সময়, মিসাইল প্রতিরোধ করতে। এই ঠান্ডা যুদ্ধ শেষ হবার আগে এই পৃথিবী আসলেই এক চরম অনিশ্চয়তার ভেতর ছিল। কারন, রাশিয়া আর আমেরিকা এই যুদ্ধে অবর্তিন হয় এবং দুইজন তো আর জিতবে না। একজন জিতবে। কিন্তু দুজনের কাছেই আছে পারমানবিক অস্ত্র এবং মিসাইল। রাশিয়ার মিসাইলগুলো ছিল মাটিতে থেকে উড্ডয়নের জন্য, কিন্তু আমেরিকার মিসাইলগুলো হলো সমুদ্রের সাবমেরিনের মধ্যে, যেগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে। চলমান কোনও বস্তু থেকে আরেকটি বস্তুকে আঘাত করতে হলে চাই স্যাটেলাইট ব্যবস্থা। তার জন্যই বসানো হলো এই জিপিএস। তার ফলে আমেরিকা রাশিয়ার যেকোনও মিসাইল আকাশেই ধ্বংস করে দেয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। এই পৃথিবীর ভাগ্য ভালো যে, রাশিয়া সেই রণে ভঙ্গ দিয়েছে। তা না হলে, এখনও আমাদের সেই কঠিন সময়ের ভেতর দিয়ে যেতে হতো।

এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আমেরিকা পৃথিবীর যেকোন স্থানের যেকোন বস্তুকে সূচারুভাবে টার্গেট করতে পারে কয়েক সেন্টিমিটারের মধ্যে। আমেরিকা যে মিসাইলগুলো কুয়েতে এবং বর্তমানে আফগানিস্তানে ছাড়ছে সেগুলোর সবই সেই জিপিএস নিয়ন্ত্রিত। আর এখন চাইলেও কোনও দেশ আমেরিকার কাছাকাছি আসতে পারবে না। কারন, আমেরিকা পুরো আকাশ জুড়ে স্যাটেলাইটগুলো এমনভাবে ছেড়েছে যে, নতুন কেউ আর সেই অক্ষে কোনও স্যাটেলাইট ছাড়তে পাড়বে না। তাই আকাশসীমা সর্বদা আমেরিকারই থাকবে।

এই জিপিএস রাশিয়ার পতনের পর খুব একটা ব্যবহার করতে হয়নি। তাই তখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আমেরিকা তার এই ক্ষমতা ভালো কাজে ব্যবহার করবে। তার ফলেই এলো গাড়ির ভেতর নেভিগেশন সিষ্টেম যার মাধ্যমে আগে থেকেই রাস্তার ডিরেকশন পাওয়া যায়। গাড়িকে ঠিকানা দিলে বলে দিতে পারে কিভাবে সেখানে পৌছানো যাবে। যারা হিমালয়ে উঠতে যান, তারাও সঠিক অবস্থান নির্নয়ের জন্য ব্যবহার করেন এই জিপিএস।

কিন্তু আফগানিস্তানের সাথে যুদ্ধ লেগে যাওয়ায় সেই জিপিএস সিষ্টেমের সফটওয়্যার আপগ্রেড করতে হচ্ছে।

এবার মার্টিনা পর্দার দিকে দেখিয়ে বললো, দেখো। এর নাম হলো ন্যাভষ্টার। এটা বানিয়েছিল রকওয়েল ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি কম্পানী। এগুলোর আল্টিচিউড হলো দশ হাজার নয়শ মাইল, ওজন উনিশ পাউন্ড (অক্ষে)। আকার পাখাসহ সতেরো ফুট, অরবিটাল পিরিয়ড বারো ঘন্টা। ইকুইটরিয়াল প্লেন

থেকে এগুলো পঞ্চান্ন ডিগ্রী সড়ে থাকে। এগুলো একেকটা বাচে সাড়ে সাত বছর করে। সারা পৃথিবীতে পাচটি ভূকেন্দ্র আছে যেখান থেকে এদেরকে নিয়ন্ত্রন করা যায়। সেগুলোর স্থানগুলো হলো হাওয়াই, এসেন্সিয়ন দ্বীপ, ডিয়েগো গার্সিয়া, কাওয়াজালেইন এবং কলেরেডো।

তারপর মার্টিনা পর্দায় জুম করে চব্বিশটি স্যাটেলাইট থেকে তিনটি স্যাটেলাইটকে সামনে নিয়ে এসে বললো, তুমি নিশ্চই জানো যে পৃথিবীর যেকোনও স্থানকে টার্গেট করতে অন্ততঃ তিনটি স্যাটেলাইট প্রয়োজন। কিন্তু তাতে একশভাগ সঠিক মাপ পাওয়া যায় না। একশভাগ সঠিক পেতে হলো আমাদের দরকার চারটি স্যাটেলাইটের ইনপুট। ডিফেন্স আমাদেরকে তিনটি স্যাটেলাইটের সিউডো র‍্যানডম কোড দিয়েছে। ওরা আমাদেরকে পুরো বিশ্বাস করছে না। তাই বলে তুমি ভেবো না, আমি তিনটে দিয়েই আমার পরীক্ষা চালাবো।

তাহলো তুমি আরেকটির কোড পাবে কোথেকে? আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

আরেকটির কোড আমি বের করছি। মার্টিনা আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসে।

ওরা তো সারাক্ষন ওগুলো মনিটর করছে। ওরা তো টের পেয়ে যাবে তাই না? আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

দাড়াও তোমাকে ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। মার্টিনা বলা শুরু করলো-

স্যাটেলাইটের একটি মাত্র সমস্যা আছে, তাহলো সময় বা ঘড়ি। এই পৃথিবীতে দুটো ঘড়ির সময় এক করা খুবই মুসকিল। তুমি একই শহরে তোমার বন্ধুর ঘড়ির সাথে তোমার ঘড়ি মিলিয়ে দেখো, দেখবে ভিন্ন সময়। কয়েক সেকেন্ড এদিক সেদিক হলেও হবে। এমনকি কি কমপিউটারের ঘড়িও তাই। তুমি সেকেন্ডের কাটা কোনওভাবে মেলাতে পারলেও মিলিসেকেন্ড বা মাইক্রোসেকেন্ডর ঘর মেলাতে পারবে না। স্যাটেলাইটেরও সেই সমস্যা আছে। স্যাটেলাইটগুলো ব্যবহার করে এটমিক ঘড়ি, সেগুলো যথেষ্ঠ সঠিক। তারপরেও মাটিতে একটি রশ্মি ফেলে তার ডাটা নিতে কয়েক সেকেন্ডের একটি হেরফের হয়ে থাকে। আবার এই সময়ের কারনেই ডিফেন্স প্রতিটি স্যাটেলাইটকে প্রতি সেকেন্ডের ব্যবধানে মনিটর করতে পারে না, তাদেরকে প্রতি মিনিটের ব্যবধানে পর্দায় দেখতে হয়। আমি সেই সময়ের ভেতরই একটি স্যাটেলাইট চুরি করবো।

বলো কি তুমি? আমাকে শুলে চড়াবে নাকি? আতকে উঠলাম আমি।

দ্যাখো, এতো ভয় পেলে তো তোমাকে এই প্রজেক্টে রাখা যাবে না। আমার সঠিক পরিমাপের জন্য চারটি স্যাটেলাইট চাই। তাই এটা করতেই হবে। তুমি আমার উপর ভরসা রাখো। মার্টিনা একটু রেগে কথাটা আমাকে বললো।

আমি একটু চুপসে গিয়ে বললাম, তুমি ওটার সিউডো র‍্যানডম কোড পাবে কিভাবে?

যাক ভালো ছেলের মতো এখন কথা বলছো। শুনো সেই ব্যবস্থাও করে রেখেছি। তারপর মার্টিনা বলতে থাকে, এই যে সাড়ে চারশ রাউটার দেখছো, আমি ওদেরকে কাজে লাগাচ্ছি।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার তো কেবল আমার নেটওয়ার্কের রাউটারগুলো ব্যবহার করার কথা।

মার্টিনা বললো, সে তো ঠিকই আছে। আমি তোমার নেটওয়ার্কের রাউটারগুলো ব্যবহার করছি স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কে ঢুকার জন্য। আর ওই বাকি সাড়ে চারশ রাউটারকে ব্যবহার করছি সারা পৃথিবীর কমিপউটারগুলোকে ব্যবহার করার জন্য।

আমি ভড়কে গেলাম। বললাম, খুলে বলো।

মার্টিনা বলে, শুনো, প্রতিমুহুর্তে এই পৃথিবীতে গড়ে সতেরো মিলিয়ন কমপিউটার ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত থাকে। তাদের বেশিরভাগেরই কাজ হলো ব্রাউজ করা, নয়তো ই-মেল পাঠানো, নয়তো গেম খেলা। তাদের সবারই সিপিইউ পচানব্বইভাগ অব্যবহৃত থাকে। আমার বুদ্ধিমান সফটওয়্যার এই রাউটারগুলোর মাধ্যমে সেই কমিপউটারগুলোতে প্রবেশ করে তাদের অব্যবহৃত সিপিইউকে কাজে লাগায়। শুধু একবার ভেবে দেখো, সতেরো মিলিয়ন কমপিউটারের সিপিইউ একত্রে ব্যবহার করলে কি বিশাল পরিমান ক্ষমতা।

মার্টিনার বুদ্ধি দেখে আমি হতবাক। এক সাথে সতেরো মিলিয়ন কমপিউটারের ক্ষমতা চুরি করে ব্যবহার করবে, সেটা কমপিউটারের মালিকেরা ঘুনাক্ষরেও টের পাবে না। তাদের কাজের গতি একটুও কমবে না। মার্টিনা শুধু ব্যবহার করবে অব্যবহৃত সিপিইউ। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি এই সম্মিলিত ক্ষমতা দিয়ে সিউডো র‍্যানডম কোড জেনারেট করতে কাজে লাগাবে?

মার্টিনা আমার কাধে হাত চাপড়ে বললো, একদম ঠিক। এই রাউটারগুলো এখন সেই কাজটিই করছে।

একথা বলেই মার্টিনা লেগে গেলো তার যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে। আমি বললাম, তোমার কমপাইল হতে হতে, এই ফাকে আমি কি আমার অফিস কক্ষ থেকে ঘুড়ে আসতে পারি?

মার্টিনা বললো, অবশ্যই।

চতুর্থ স্যাটেলাইটের জন্য সিউডো র‍্যানডম কোড তৈরী করে সেটার কর্তৃত্ব নিতে সারা দিন চলে সন্ধ্যে হয়ে গেলো। ব্যাপারটি এতো সহজ ছিল না। মার্টিনা বললো, তুমি তোমার নেটওয়ার্ক প্রস্তুত রাখো, আমরা এখন সফটওয়্যারটা আপলোড করবো।

আমি আমার নেটওয়ার্কের আঙ্গিনায় গিয়ে ওকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলাম। মার্টিনা আপলোডের কমান্ড চালিয়ে দিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমাদের নতুন সফটওয়্যার চলে গেলো পৃথিবী থেকে দশ হাজার নয়শ মাইল দূরের চারটি স্যাটেলাইটে। মার্টিনা তার চেয়ারটাতে আরাম করে বসে বললো, এবার দেখো কি হয়। আচ্ছা তোমার নেটওয়ার্কে ব্যাকআপ আছে তো? সফটওয়্যারে কোনও সমস্যা থাকলে তাড়াতাড়ি ব্যাকআপে চলে যেতে হবে।

তারপর মার্টিনা বিড়বিড় করে বললো, সমস্যা হবার কথা নয়, ওটাকে আগে সিমুলেটর চালিয়ে পরীক্ষা করে নেয়া হয়েছে।

এরপর মার্টিনা পর্দায় যা নিয়ে এলো সেটা দেখে তো আমি অভিভূত।

বিশাল সেই পর্দায় সে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ - সেই এলাকার পুরো মানচিত্র নিয়ে এলো। তারপর জুম করে চলে গেলো কাবুল শহরে। ওমা, সেখানে মানুষজন অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সব বোরকা পড়া মহিলারা কেমন করে যেন হাটছে। আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি চিৎকার করে বললাম, ওয়াও এটা আমি কি দেখছি!

মার্টিনা বললো, তোমাকে এখানে আজ আনার আরেকটি কারন আছে, যা এতক্ষণ বলিনি।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, সেটা কি সিগ্গির বলো?

মার্টিনা বললো, আমাদের সফটওয়্যার যে কাজ করছে, সেটা বুঝতে হলে কিছু জানা ডাটার উপর সেটা চালিয়ে দেখতে হবে। তুমি যে আফগানিস্তানের এই ছবি গুলো দেখে ভাবছো, এগুলো সত্যিই সেই লোকগুলোর ছবি, সেটা তো নাও হতে পারে। আমরা তো ওখানে কাউকে চিনি না। আমি স্যাটেলাইটগুলোকে তোমার দেশের উপর পজিশনিং করাচ্ছি। দেখো, তুমি কাউকে চিনতে পারো কিনা?

বলেই মার্টিনা তার কী-বোর্ড থেকে কিছু ডাটা চাপলো, বাংলাদেশের মানচিত্র বড় হয়ে এলো। তারপর বললো, দাড়াও আমি ঢাকা শহরকে এনে দিচ্ছি।

বলতেই পর্দায় ভেসে এলো আমার প্রিয় শহর। মার্টিনা যেখানে নিয়ে গেছে সেটা হলো জিপিওর মোড়। তখন ঢাকায় ভোর। রাস্তাঘাট খালি। আমি বললাম, তুমি আর জায়গা পেলে না? অন্য কোথাও যাও।

কেন এটার কি হয়েছে? তাহলে তুমি ঠিকানা বলো? মার্টিনা হাসতে হাসতে বললো।

আমি আমার মিরপুরের বাসার ঠিকানা দিলাম। ও সেটা টাইপ করে বোতাম চাপতেই, ভেসে এলো মিরপুরের বাসার সামনের ভাগ। অর্নব বারন্দায় গ্রীল ধরে দাড়িয়ে নিচে কার সাথে যেন কথা বলছে। ড্রাইভার এসেছে বোধহয়। স্কুলে যাবে হয়তো। আমি চিৎকার করে বললাম, হ্যা এটাই তো আমার বাসা। আমার মা'কে দেখাও তো?

তোমার মা তো ঘরের ভেতর। তাহলে, তোমার মাকে কোনও ধরনের ফোন ব্যবহার করতে হবে। তোমার বাসায় কি সেল ফোন আছে? মার্টিনা জানতে চাইলো।

আমি বললাম না। তবে সাধারন ফোন আছে। আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম।

সেটা হলেও হবে। তবে একটা কাজ করতে হবে। সেই ফোনে তুমি ফোন করো। সেই বাসায় যে কেউ ফোন তুললেই আমরা সেটা দেখতে পাবো। মার্টিনা সমাধান বাতলে দিল।

আমি আমার সামনের ফোনটি থেকে ডায়াল করলাম ০১১-৮৮০-২-৯০০---- একি কান্ড! পর্দায় ভেসে উঠলো পুরো ঘরের ছবি। আমার ছোট বোন লিপু ঘুম থেকে উঠে ফোন ধরে হ্যালো হ্যালো করছে।

আমি লিপুকে বললাম, আম্মা কোথায় রে?

লিপু ওদিক থেকে বললো, ওহ দাদা? আম্মা তো ময়মনসিংহ।

আমি আচ্ছা ঠিক আছে বলে রেখে দিলাম।

তারপর মার্টিনাকে আমার ময়মনসিংহের বাসার ঠিকানা দিলাম। মার্টিনা সেটা টাইপ করতেই পর্দায় ভেসে এলো পুরো বাড়িটা। আম্মাকে দেখতে পেলাম ভোরে হেটে এসে বাড়ির উঠানে কারো সাথে কথা বলছেন। আমি ফোন করলাম, ০১১-৮৮০-১৯-৫৩--- ; আম্মা উঠোন থেকে এসে ফোন ধরলেন না, হয়তো শুনতে পাননি। তাই কথাও হলো না।

এই ক্ষমতা দেখে, মার্টিনাকে বললাম, জিনিস তো মনে হয় কাজ করছে।

মার্টিনা মুচকি হেসে বললো, কাজ তো করারই কথা। তোমার দেশের গোপন কি আছে বলো, দেখি সেটার উপর কাজ করে কি না।

আমি বললাম, দুই নেত্রী দেশ চালাচ্ছেন। দেখো তো তারা এই ভোরে কে কি করছেন? বলেই আমি তাদের বাসার ঠিকানা দিলাম।

মার্টিনা বললো, ওহে ওদের বাড়িতে তো কয়েকটা করে সেল ফোন। দাড়াও কাজ হবে, বলেই মার্টিনা পর্দায় নিয়ে এলো তাদের নিজস্ব ঘর।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না না এটা থাক, তুমি এটা বাদ দাও। তুমি বরঞ্চ আমার পছন্দের একটা মেয়েকে দেখাও।

আমি মার্টিনাকে আমার পছন্দের একজন টিভি মডেলের বাসার টেলিফোন নাম্বারে ডায়াল করে দিলাম। পর্দায় যা ভেসে এলো তাতে মার্টিনাও লজ্জা পেয়ে গেলো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, তুমি তাহলে ভালই আছো। তারপর হঠাৎ মনে হলো, পেছন থেকে তো বেশ মোটা লাগছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা তুমি ঠিক জায়গায় গেছো তো?

মার্টিনা বললো, তোমাদের ওখানে ফোনের অবস্থা খুবই খারাপ। বেশ ঝামেলা আছে সিগনালে। ক্রশ কানেকশন হলে কিন্তু আমি কিছু জানি না। সেজন্যই সেল ফোন হলে ভালো।

আমি মানিব্যাগ ঘেটে ওর সেল ফোন নাম্বার পেলাম। সেটা দিতেই এবারে আসল মেয়েটির ঘর ভেসে এলো। সে তখনও ঘুমুচ্ছে।

এগুলো করতে করতে রাত হয়ে গেল।

মার্টিনা বললো, আজ সারা রাত এটা চলতে থাকুক। রেকর্ড করে রাখছি। কাল এসে ডাটা দেখবো। আমি বললাম, তুমি এই মেয়েটির উপর ফোকাস করে রাখো। দেখি সে সারাদিন কি করে।

আমি চলে আসতে চাইলাম। মার্টিনা বললো, একটু অপেক্ষা করো। ডী-র একটা কাজ আছে।

আমি বললাম, কি কাজ?

মার্টিনা জবাব দিল, ডী তোমার মাথা থেকে ওই স্মৃতিটুকু মুছে দেবে।

আমি পাশের সুইচ কক্ষে গেলাম। ডী আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি দিয়ে আমার মাথা থেকে সব স্মৃতি মুছে দিল। আমি আমার অফিসে চলে এলাম।

ব্যাপারটি আমি আগেই টের পেয়েছিলাম। তাই সকালে ল্যাব থেকে অফিসে এসে ডী-র সিষ্টেমে ঢুকে স্মৃতি মুছে ফেলার সার্কিটে একটা লজিক পরিবর্তন করে দিয়ে এসেছিলাম। মার্টিনা সেটা টের পায়নি। টের পেলে আমাকে আজ আর এই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে হতো না।

রাতে প্রধান দরজা দিয়ে যখন বেরুচ্ছি, তখন ডী বলছে, তুমি আজ আমাকে বোকা বানিয়েছো মিষ্টার। পরবর্তি সময়ে মনে থাকে যেন।

আমি তাকে বললাম, টেক ইট ইজি। তারপর মুচকি হেসে পা বাড়ালাম পার্কিং লটের দিকে।

- শেষ -

ই-মেলঃ zs@e-mela.com